অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সমস্যা দূর করে মহাদেশে শান্তি বজায় রাখতে পারবে। চুক্তিতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ না থাকায় বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গেও তাল রাখা সম্ভব হবে। ব্রিটিশ সংসদের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের নীতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শক্তিসমবায়ের মূল নীতি 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধান' হওয়ায় ব্রিটেনের পক্ষেও এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ছিল।

সর্ব-ইউরোপীয় সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর জন্য কিছুদিন পর পর বৈঠকে মিলিত হওয়া শক্তি-সমবায়ের অন্যতম শর্ত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের অল্প পরেই বসেছিল এরকম চারটি বৈঠক আয় ল্য শ্যাপেল (Aixla Chapelle)—১৮১৮; ট্রপ্পো (Troppau) ১৮২০; লাইবাখ (Laibach)—১৮২১ এবং ভেরোনা (Verona)—১৮২২।

আয় ল্য শ্যাপেল-এর বৈঠক, ১৮১৮

১৮১৮ সালের প্রথম বৈঠকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বৈঠকে ফ্রান্স থেকে দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় এবং ফ্রান্সকে পঞ্চম শক্তি হিসেবে ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নরওয়ে ও ডেনমার্কের সঙ্গে বার্নাকোত সন্ধি অনুযায়ী আচরণ না করার অভিযোগে সুইডেনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মনাকোর শাসনকর্তাকেও এই বৈঠকে কিছু প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই বৈঠকেই শক্তিসমবায়ের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌ-জাহাজ পাঠিয়ে বার্বারী জলদস্যুদের দমন করবার প্রস্তাব দিয়ে ব্রিটেন আপত্তি জানায়। তার আশঙ্কা ছিল এতে ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার বিক্ষুব্ধ উপনিবেশ-এ সামরিক হস্তক্ষেপের স্পেনীয় সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে ব্রিটেন ঐ অঞ্চলে তার বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে। আবার ব্রিটেন যখন অবৈধ দাসব্যবসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক-জাহাজ তল্লাসীর প্রস্তাব করে, তখন অন্য সদস্যরা তাতে বাধা দেয়। কেননা এতে ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

ট্রপ্পোর বৈঠক, ১৮২০

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্বিরোধ ট্রপ্পো কংগ্রেসে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮২০ সালে নেপল্‌স্, স্পেন ও পর্তুগালে বিদ্রোহীদের চাপে শাসকগোষ্ঠী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে বাধ্য হয়। কিন্তু এতে শক্তিসমবায়ের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়। ট্রপ্পো বৈঠকে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হয়। মেটারনিখ-এর পরামর্শে এই বৈঠকে যে 'ট্রপ্পো প্রটোকল' রচিত হয়, তাতে বলা হয়, যদি কোন দেশ অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক শাসন-সংস্কার করে, তাহলে শক্তি সমবায় সেই দেশকে জোট থেকে বহিষ্কার করতে পারবে বা সেই দেশের শাসন-সংস্কারকে বাতিল করতে পারবে এবং প্রতিসংস্কারের জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারবে। এটা আসলে ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতিরাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রস্তাব। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বৈঠক নিষ্ফল হয়।

লাইবাখ-এর বৈঠক, ১৮২১

এই বৈঠকে ইতালির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ জড়িত, এই নীতি স্বীকার করে অস্ট্রিয়াকে নেপল্‌সের বিদ্রোহ দমনের অধিকার দেওয়া হয় এবং অস্ট্রিয়া বিদ্রোহ দমন করে ফার্দিন্যান্দকে নেপলসের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

ভেরোনার বৈঠক, ১৮২২

লাইবাখে কোন বড় সংকট দেখা না দিলেও সংকট ঘনীভূত হয় ভেরোনা বৈঠকে। এই বৈঠকে দুটো প্রধান সমস্যা ছিল, একটি তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিদ্রোহ, আর অন্যটি স্পেনের গণবিদ্রোহ। অস্ট্রিয়া নেপল্‌সে হস্তক্ষেপ করেছে, এই উদাহরণ দেখিয়ে রাশিয়া এই বৈঠকে গ্রীসে অভিযানের অনুমতি চায়, আর স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের অনুরোধে ফ্রান্স স্পেনের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয়। ব্রিটেন দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করে। রাশিয়া সামরিকভাবে নিরস্ত হয়, কিন্তু স্পেনের রাজাও বুরবোঁ বংশোদ্ভূত, সুতরাং তাকে সাহায্য করা অবশ্যকর্তব্য এই অজুহাতে ফ্রান্স ব্রিটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনে হস্তক্ষেপ করে। এর উত্তরে ক্যাসেলরি-র স্থলাভিষিক্ত ব্রিটিশ বিদেশ সচিব দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন এবং তার দেখাদেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঐ স্বাধীনতা মেনে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরো এই সময়েই তার বিখ্যাত 'মন্‌রো ডকট্রিন' ঘোষণা করে আমেরিকায় ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেন। ফলে মেটারনিখের হস্তক্ষেপ নীতি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, ব্রিটেন শক্তিসমবায় থেকে সরে আসে এবং কার্যত ইউরোপীয় শক্তিসমবায় নষ্ট হয়ে যায়।

৩(ক).৯ শক্তিসমবায়ের ব্যর্থতা

আসলে ইউরোপীয় শক্তি-সমবায়ের ব্যর্থতার বীজ গোড়া থেকেই উপ্ত ছিল। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই নিজের ভূখণ্ড-অধিকার বিষয়ে নিজস্ব নীতি ও স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ছিল, জোট-নীতির সাফল্য তাই ছিল অনিশ্চিত। সিম্যানের মতে, সেই সময়ে 'কংগ্রেস সিস্টেম' বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোন চার্টার। তাছাড়া নেপোলিয়ন পতনের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যে সামাজিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল, ১৮২০-র পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সেই ভয় থেকে তাদের মুক্তি দেয়। সুতরাং জোটবদ্ধ রক্ষণশীলতার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়, দেখা দেয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ত্বরান্বিত হয় শক্তিসমবায়ের পতন। কিন্তু তখন একক চেষ্টায়, রক্ষণশীলতার দুর্গকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন একজন। তিনি মেটারনিখ, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর।

৩(ক).১০ মেটারনিখ ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

মেটারনিখ ১৮০৯-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন এবং এই সময়ে শুধু অস্ট্রিয়ার নয়, ইউরোপের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় হিসাবে এটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁর কর্মকুশলতার একাধিপত্যের জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়ের নাম হয়েছে মেটারনিখের যুগ—Era of Metternich, তাঁর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সৌজন্য, কূটনীতিক ভুয়োদর্শিতা ও ক্ষমতা, লোকচরিত্র পাঠের অত্যাশ্চর্য শক্তি, জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের সহজ প্রতিভা—সব মিলে তাঁর মধ্যে এত বহুমুখী গুণের সমাবেশ হয়েছিল যে, ভিয়েনা বৈঠকে তাঁর প্রাধান্য ও পরে ইউরোপীয় ব্যাপারে তাঁর নৈতিক একাধিপত্য অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। আত্মক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং এই আত্মপ্রত্যয় শত বিঘ্ন এবং পরাজয়েও অটুট ছিল। এমনকি, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর যখন অস্ট্রিয়ার সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন এবং মেটারনিখ ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনও তাঁর মুখে শোনা যায়—আমার মন কখনও ভুল করেনি—'My mind has never entertained error'.

ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে ফরাসি বিপ্লবকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অস্বীকার করার জন্যই মেটারনিখ বিখ্যাত। ফরাসি বিপ্লবকে নিজের অলঙ্কৃত ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য হেয় তিনি করেছেন। 'It was a disease which must be cured, the volcano which must be extinguished, the gangrene which must be burned with hot iron, the hydra with jaws open to swallow up the soical order.' অর্থাৎ, — ফরাসি বিপ্লব একটা মহাব্যাধি, যার চিকিৎসার প্রয়োজন—একটি আগ্নেয়গিরি যার নির্বাপনের প্রয়োজন—একটা গলিত ক্ষত যাকে গরম লোহা দ্বারা পোড়ানো দরকার, একটা সহস্রশীর্ষ দানব যার উন্মুক্ত মুখবিবর সামাজিক কাঠামোকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিপ্লবের প্রতি মেটারনিখের এই অশ্রদ্ধা তাঁর সব কাজের মধ্যে, প্রতিফলিত, কি অভ্যন্তরীণ নীতিতে কি পররাষ্ট্র-পরিচালন পদ্ধতিতে।

অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী মেটারনিখ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার দমন করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভিয়েনা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতেন, পার্লামেন্টীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর গভীর ভীতি ছিল। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ডেভিড টমসনের মন্তব্য : "He also had a philosophy of conservatism, a theory of how balance might be kept in Europe as a Continent....." মেটারনিখ-এর মতে, প্রতিটি দেশের মধ্যেই সমাজ-ব্যবস্থায় এক ধরনের ভারসাম্য (equilibrium) উপস্থিত থাকে, এবং সেই সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। একমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলাই ঐ ভারসাম্যকে বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও একটা সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার, তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করে একটি অতিরাষ্ট্রীয় (super-national) ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন। মেটারনিখ বিশ্বাস করতেন, ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মেটারনিখের বহু প্রচারিত 'সিস্টেম' বা 'ব্যবস্থা' তৈরি হয়েছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জাতিগত এবং অন্যান্য অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটের বহু পুরাতন 'divide and rule' নীতিকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। এবং তাঁর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল বেহেমিয়াতে জার্মান সৈন্যবাহিনী এবং লম্বার্ডিতে হাঙ্গেরিয়ান সেনা উপস্থিত রেখে। তাঁর 'সিস্টেম' জার্মানিকে একটি দুর্বল ও শিথিল রাষ্ট্রসংঘে পরিণত করে রেখেছিল যাতে জার্মান ডায়েট (Diet, সংসদ) অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা দিয়ে তিনি অস্ট্রিয়াকে বেঁধে রেখেছিলেন। গুপ্তচর ছড়ানো ছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল, বিদেশী বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ওপর সরকারের তরফ থেকে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। পুলিশের হাতে ছিল বিশেষ ক্ষমতা। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ভিয়েনাতে একটি বিশেষ দপ্তর বসিয়েছিলেন, সেখানে বিদেশী চিঠিপত্র খুলে দেখে, তার অর্থ অনুধাবন করে, সন্দেহজনক তথ্য চ্যান্সেলারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে, তারপর আবার সেগুলি ঠিকমত বন্ধ করে যথাস্থানে পাঠানো হতো। ফলে মেটারনিখ ইউরোপের বিভিন্ন প্রশাসনিক গোপন কথা জানতে পারতেন, দেশে দেশে তাঁর অনেক গুপ্তচর উপস্থিত থাকত যারা তাকে সরাসরি খবর পাঠাত।

মেটারনিখ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জার্মানি। সময়টি ছিল জার্মানিতে রোমান্টিক চেতনার যুগ। যদিও কোন সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন উনিশ শতকের প্রথমে জার্মানিতে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু শিক্ষিত জার্মানদের ভাবজগতে রোমান্টিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, আন্তর্জাতিকতা এবং সার্বজনীনতার পরিবর্তে তাঁরা উপাসনা করেছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির। ফ্রাইডরিখ শ্লেগেল এবং ফ্রাইডরিখ নেভোলিশ রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি হয়েও জার্মানজাতির অতীতের কথা প্রচার করেছিলেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদারনীতির প্রচার ও প্রসার। সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্রোহী কিছু ছাত্র সংগঠন বা বার্শেনস্কাফ্‌টেন (Burchenschaften)। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্টবুর্গ উৎসব করেছিল, যেখানে তারা 'লাইপজিগ'-এর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় এবং 'রিফর্মেশন' বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-আন্দোলনের ত্রিশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব পালন করেছিল। দুটি ঘটনাই স্বৈরাচার বিরোধী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কট্‌জব্যু হত্যাকাণ্ড। কট্‌জব্যু (Kotzebue) ছিলেন এক প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর তাঁর আক্রমণ জার্মান লিবারেলদের অতিষ্ট করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিকে ১৮১৯-এ হত্যা করা হয়েছিল। এই পটভূমিকাতেই মেটারনিখ সুচতুরভাবে তাঁর 'কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা' জার্মানিতে প্রয়োগ করেন।

ভিয়েনা চুক্তি জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে রাইন-এর রাজ্যসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, এবং তাঁর পতনের পরে ভিয়েনা কংগ্রেস-এর নেতারা সৃষ্টি করেছিল জার্মান কনফেডারেশন। কনফেডারেশন-এর সাংবিধানিক আইনে (Act of Confederation) বলা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হবে জার্মানির অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং জার্মান রাজ্যসমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করা। জার্মান রাজ্যগুলি নানা সমস্যায় একজোটে কাজ করবে সে কথাও বলা হয়েছিল। এই কনফেডারেশনের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দ্বিকক্ষযুক্ত ডায়েট (Diet) (পার্লামেন্ট-এর সমতুল্য) গঠিত হয়েছিল যার বৃহত্তর কক্ষে রাজ্যগুলিরই ন্যূনতম একজন (কোন কোন রাজ্যের ৩-৪টি) প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে

সাধারণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভোট দিতেন। এই প্রতিনিধিরা কিন্তু শাসকদের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। এই ডায়েট স্বাধীন এবং কার্যকর একটি প্রশাসনিক সংস্থায় রূপান্তরিত হতে না পারায় ক্রমশ মেটারনিখের অনুশাসন এবং তাঁর তত্ত্বাবধান মেনে নিয়েছিল, আর তাঁর নির্দেশিত পথেই লিবারেল বা উদারপন্থী জার্মানদের আক্রমণ থেকে জার্মানিকে বাঁচাবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। একটি দুর্বল প্রশাসনিক সংস্থাকে সহজেই অস্ট্রিয়ান চ্যান্সেলার নিজের দপ্তরে রূপান্তরিত করেছিলেন। ওয়ার্টবুর্গ উৎসব এবং কট্‌জব্যু হত্যাকাণ্ডের পরে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর প্রচারের দ্বারা জার্মানির শাসকদের উদারনীতির পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সহজেই সন্দিহান করে তোলেন, এবং শীঘ্রই ঐ দুর্বল জার্মান ডায়েটের মাধ্যমে তাঁর উদ্ভাবিত কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি জারী করেন (১৮১৯)।

১৮১৯-এ ফেডারেল ডায়েটএ গৃহীত কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা জার্মান কনফেডারেশন-এ এক চরম রক্ষণশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঘোষণা ছাত্র-সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে জার্মান শাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা আর সবরকম প্রকাশনা সেনসর করার ক্ষমতা দেয়। রাজনৈতিক গুপ্ত সংগঠনগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশন ও কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা অনুযায়ী গঠন করা হয়। প্রদেশীয় পার্লামেন্টগুলির ক্ষমতাও সঙ্কুচিত হয় এবং জার্মান রাজ্যগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডায়েট-এর হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

মেটারনিখের ক্রিয়াকলাপ এই সময়কার 'কনসার্ট অব ইউরোপ'কেও প্রভাবিত করেছিল। এই রাষ্ট্রজোটের কাছে প্রধানত মেটারনিখের চেষ্টায় গণবিপ্লব-বিরোধী নীতি অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ, কোন রাজ্যে গণবিপ্লব ঘটলে শক্তিসমবায় যৌথভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করবে, এই নীতি ইউরোপের প্রধান চতুঃশক্তি (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড) বাহ্যত মেনে নিয়েছিল। যদিও ব্রিটেনের এই হস্তক্ষেপ নীতিতে সমর্থন ছিল না। কিন্তু ট্রপ্পো কংগ্রেস এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ঐ কংগ্রেসে রুশ সম্রাট আলেকজান্ডার এবং মেটারনিখ একমত হয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন দেশে গণবিদ্রোহের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপনীতি ঘোষণা করেছিলেন। ট্রপ্পো কংগ্রেসে গৃহীত ট্রপ্পো প্রটোকল-এর ঘোষণা অনুসরণ করেই মেটারনিখ ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ইতালির নেপল্‌স্‌ এবং পিডমন্টে গণবিদ্রোহগুলি সৈন্য পাঠিয়ে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে মেটারনিখের ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর প্রতিক্রয়াও ছিল তীব্র। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইতালিতে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উন্নত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত থাকার দরুন ইতালির অধিবাসিরা মেটারনিখের শাসন তীব্রভাবে অপছন্দ করেছিলেন। ইতালিতে মধ্যবিত্তশ্রেণী পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন এবং সামাজিক কাঠামোকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা মেটারনিখকে মেনে নেয়নি। এমনকি পোপ এবং পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার শাসকরাও সুযোগ পেলেই মেটারনিখের বিরোধিতা করেছেন। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল দুটি ব্যাপারে—গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার সাফল্য, এবং জার্মানিতে 'জোলভেরেন'-এর প্রতিষ্ঠা, ও ১৮৩৪ নাগাদ তার পূর্ণতা লাভ। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে বেলজিয়ামের হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নরওয়ে রাজ্যটির স্বশাসনের দিকে অগ্রগতি ও জাতীয়তাবাদী আবহ তৈরি হওয়ার ব্যাপারগুলি যুক্ত করে বলা যায়, ১৮৩০ নাগাদই মেটারনিখ ব্যবস্থার নানাস্থানে ফাটল ধরেছিল।

১৮৩০-এ এবং ১৮৪৬-এ অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডে তীব্র কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু তবুও ১৮৪৬-এর ঐ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়ার প্রশাসন বহু ঘৃণিত রোবট বা শ্রমকর অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডের গ্যালিসিয়া প্রদেশে নিষিদ্ধ করে। পরে সমগ্র অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে শ্রমকর বাতিল করতে বাধ্য হয় (Act of Emancipation, 1848) ১৮৪৮-এর বিপ্লবে মেটারনিখ ব্যবস্থা তাসের বাড়ির মতন ভেঙে পড়ে।

দীর্ঘকাল ইউরোপীয় শান্তি অব্যাহত রাখতে পারলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেটারনিখ উচ্চস্তরের রাজনীতিকুশলী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে অভাব ছিল দূরদর্শী প্রতিভার। তাঁর নীতি সুবিধাবাদ ও নেতিবাদের সংমিশ্রণ; সংগঠনী কুশলতার অভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল, ফরাসি বিপ্লবের ধ্বংসকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দুই যুগের সন্ধিস্থলে তাঁর আবির্ভাব—অপসৃয়মান যুগকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, আবার আগত যুগকেও গ্রহণ করতে পারেননি। এই দুই যুগের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির মধ্যেই আছে মেটারনিখ জীবনের ট্র্যাজেডি। এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য—"I have come into the world either too early or too late. Earlier I should have enjoyed the age, later I should have helped to reconstruct it. Today I have to give my life to propping up mouldering institutions." 'এই জগতে আমার কিছু আগে বা কিছু পরে আসা উচিত ছিল। আগে আসতে পারলে যুগকে উপভোগ করতে পারতাম, পরে এলেও এই জগতের পুনর্গঠনে সহায়ক হতাম। আজ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানগুলো খাড়া রাখবার জন্য আমার জীবনপাত করতে হচ্ছে।'

৩(ক).১১ সারসংক্ষেপ

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের প্রধান ফ্রান্সবিরোধী দেশগুলো নেপোলিয়নের তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে প্রাক্-বিপ্লব রক্ষণশীল কাঠামো ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়। বৈঠক চলে ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের শেষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, এশিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থই প্রধানত রক্ষিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা উপেক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিত্ব, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর, মেটারনিখ জানতেন, ভিয়েনা ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশে বিপ্লবী ঢেউ-এর সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক অন্তর্বিরোধ যাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবে পরিণতি লাভ না করে, ভিয়েনা ব্যবস্থা যাতে অন্তত কয়েকবছর অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। চতুঃশক্তি চুক্তিতে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় শক্তিসমবায়কে এই ধরনের সংগঠনে পরিণত করেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহৎ শক্তিবর্গের চারটি বৈঠক আহূত হয়। বৈঠকের মাধ্যমে মহাদেশীয় নজরদারির এই জোটবদ্ধ প্রয়াসই ইতিহাসে 'কংগ্রেস সিস্টেম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর সঙ্গে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত যুক্ত ছিল মেটারনিখের নিজস্ব ব্যবস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ব্যবস্থা, শক্তিসমবায় এবং মেটারনিখ ব্যবস্থা—সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

৩(ক).১২ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? এই সম্মেলনে কী কী প্রধান সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?

২। ভিয়েনা চুক্তি কি শুধুই কূটনৈতিক দরাদরি ছিল? একে কি কোন অর্থেই 'Reasonable' এবং 'statesmanlike' বলা যায় না?

৩। পবিত্র চুক্তি ও পবিত্র সংঘের মূল নীতি কি ছিল? চতুঃশক্তি চুক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?

৪। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। এই সংঘ কতদূর সফল হয়েছিল?

৫। মেটারনিখের রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল? মেটারনিখ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব কোন কোন দেশের হাতে ন্যস্ত ছিল?

২। জার প্রথম আলেকজান্ডারকে মেটারনিখ 'mad man' বলেছিলেন কেন?

৩। 'Principle of Legitimacy'-র অর্থ কি?

৪। 'পবিত্র চুক্তি' সম্পর্কে মেটারনিখ কি মন্তব্য করেছিলেন?

৫। কোন কোন রাষ্ট্র চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল?

৬। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের মোট কটি বৈঠক কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

৭। নেপল্‌স্-এর বিদ্রোহ কীভাবে দমন করা হয়?

৮। 'মনরো' ডকট্রিন' কি?

৯। 'My mind has never entertained error', কী প্রসঙ্গে কে এই কথা বলেছিলেন?

১০। 'কার্লস্‌বাড্ ঘোষণা' ব্যাখ্যা করুন।

৩(ক).১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। E. J. Hobsbawm : The Age of Revolution.

২। David Thomson : Europe Since Napoleon.

৩। L. C. B. Seaman : From Vienna to Versailles.

৪। G. Rude : Revolutionary Europe

৫। Norman Davies : Europe

৭। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস

৮। চিত্রা অধিকারী : আধুনিক ইউরোপ—বিন্যাস ও বিবর্তন।

একক ৩(খ) ❑ ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব

গঠন

৩(খ).১ উদ্দেশ্য

৩(খ).২ প্রস্তাবনা

৩(খ).৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

৩(খ).৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

৩(খ).৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

৩(খ).৬ মধ্য ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

৩(খ).৭ ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

৩(খ).৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

৩(খ).৯ সারসংক্ষেপ

৩(খ).১০ অনুশীলনী

৩(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩(খ).১ উদ্দেশ্য

আগের এককটিতে নেপোলিয়ন-যুগের পরবর্তী ইউরোপীয় রক্ষণশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন, কিভাবে দুটি পর্যায়ে, পৃথক পৃথক বিপ্লবের ধাক্কায় সেই রক্ষণশীল ব্যবস্থা আবার ভেঙে পড়েছিল।

৩(খ).২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের মূল সুর ছিল দুই স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত—একদিকে সাম্য ও জাতীয়তাবাদ (equality and nationalism)। আর অন্যদিকে স্বৈরাচার, রক্ষণশীলতা আর বৈধাধিকারবাদ (autocracy, conservatism, legitimacy)। এই দুই মতের দ্বন্দ্ব ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। তবে এর মধ্যে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করে দুটি প্রধান পর্বকে চিহ্নিত করা যায়। ১৮১৫-১৮৩০, এই সময়টি হল রক্ষণশীলতার যুগ। আর ১৮৩০-১৮৪৮, এই সময়টি হল পরিবর্তনের যুগ। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকরা একজোট হয়ে সামাজিক বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে

পেরেছিলেন। এই সময়কে তাই বলা হয় রক্ষণশীলতার যুগ। কিন্তু বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পর থেকে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একের পর এক বিপ্লব সংঘটিত হতে থাকে। এই যুগটিকে তাই বলা যেতে পারে বিপ্লবের যুগ। রক্ষণশীলতার যুগ থেকে বিপ্লবের যুগে এই উত্তরণের বিষয়টিই বর্তমান এককের আলোচ্য।

৩(খ).৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

প্রতি-বিপ্লবী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর বিপ্লবী ধারণার সংঘাতকেই ১৮৩০-এর বিপ্লবের প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। আর এই সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে ১৮১৫-১৮৩০-এর ফরাসি রাজতন্ত্রের দুমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্বকে।

১৮১৫ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ফরাসি সিংহাসনে ছিলেন অষ্টাদশ লুই। ভিয়েনা ব্যবস্থার বৈধ অধিকার-এর নীতির ভিত্তিতে বুরবোঁ বংশের এই রাজা সিংহাসনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি মেটারনিখের মতো বা রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতো অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। কঠোর প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা স্থাপন বা চতুর্দশ লুই-এর চরম একনায়কতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর যে ফ্রান্সে সম্ভব নয়, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রশাসনিক সনদ অনুমোদন করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা মেনে নিয়ে, ব্যক্তিগত সাম্য, ধর্মের স্বাধীনতা আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। স্বভাবতই উগ্র রাজতন্ত্রীরা এতে খুশী হয়নি। দক্ষিণ ফ্রান্সে তারা অচিরেই দাঙ্গা বাধিয়েছিল, যা white Terror বা শ্বেত সন্ত্রাস নামে খ্যাত। এই সময়েই নিহত হয়েছিলেন নেপোলিয়নের একসময়ের সহকারী 'নে' (Ney) এবং ফরাসি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী দ্যুক দ্য বারি (Duc de Berry)। পরিস্থিতির চাপে অষ্টাদশ লুই উদার রাজতন্ত্রের আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটুকু রাজকীয় উদারতার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই ফরাসি বুর্জোয়া নেতৃত্ব আবার নিজেদের সংগঠন বাড়িয়ে নিয়ে ফরাসি জনগণকে আবার বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিল। যেহেতু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা একটুও কমেনি, তাই বিদ্রোহ তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিতই ছিল।

এই অবস্থায় সিংহাসনে এসেছিলেন দশম চার্লস। তিনি ছিলেন উগ্র রাজপন্থীদের নেতা, সুতরাং তাঁর আমলে অষ্টাদশ লুই-এর বিপরীত প্রবণতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে জেসুইটদের ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং ধর্মীয় সমালোচনা বন্ধ করবার জন্য আইন পাশ করেছিলেন। চার্চ ও অভিজাতদের সব সুযোগ সুবিধে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে যাজকদের সাহায্যে শাসন করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর সরকারকে বলা হত, 'Government by Priests, through Priests, for Priests'। সব সংস্কারের বিরোধী ছিলেন দশম চার্লস। তাঁর রাজত্বকালে মাতিনিয়াক (Martignac), পলিনিয়াক (Polignac) প্রভৃতির নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাগুলির চরিত্রও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই রাজতন্ত্রের লড়াই ছিল অনিবার্য।

এই অবস্থায় ফ্রান্সে ১৮৩০ সালে উদার বুর্জোয়া গোষ্ঠী সংসদে গরিষ্ঠতা অর্জন করে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা দশম চার্লসকে বশে আনতে না পারায় সেখানে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দশম চার্লস নতি স্বীকার করেননি, কুদেতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০-এর ২৬শে জুলাই চারটি অর্ডিনান্স জারি করেন : (১) সংসদ আবার ভেঙে দেওয়া হয়। (২) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হয়। (৩) সংশোধিত নির্বাচনী আইনে নির্বাচকদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে নামিয়ে আনা হয় ২৫০০০০-এ এবং (৪) নতুন নির্বাচনের একটি দিনস্থির করা হয়।

অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে মুদ্রক ও সাংবাদিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের সর্বত্র ব্যরিকেড তৈরি করা হয় এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তিনদিন লড়াইয়ের পর (Lestrois glorieuses, July 27-29, তিনটি গৌরবময় দিন, জুলাই ২৭-২৯) প্যারিসের বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়। পরিস্থিতি যে এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে চার্লস তা একেবারেই বুঝতে পারেননি এবং সম্ভাব্য বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। যখন অনেক সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর সিংহাসন রাখতে চাইলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পৌত্র দ্যুক দ্য বর্দোর (Duc de Bordeaux) অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্যারিসে এই রাজবংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্যারিস লুই ফিলিপ 'দ্যুক দলেয়াঁর' (Louis Philppe, Duc D'orleans) হাতে সিংহাসন তুলে দিয়েছে।

৩(খ).৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

দ্য তকভিল (De Tocquville) লিখেছেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যায়। লুই ফিলিপকে রাজমুকুট দেওয়ার আগে সনদের সংশোধন করে, এই শ্রেণী নিজস্ব স্বার্থরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেছিল। পুরনো সনদের ভূমিকাটি বাদ দিয়ে ঐশী রাজতন্ত্রের ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। রাজার অর্ডিনান্স ঘোষণার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, উচ্চতর কক্ষের বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করা হয়; ভোটাধিকার কিছুটা প্রসারিত করার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ ভোটাধিকার পায়। রাজার উপাধির (title) পরিবর্তন করা হয়। এখন থেকে রাজার উপাধি হয় "King of the French" বা ফরাসিদের রাজা, আগেকার উপাধি ছিল King of France বা ফ্রান্সের রাজা। বুরবোঁদের শ্বেত পতাকার পরিবর্তে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

এই বিপ্লব চার্চ ও অভিজাত শ্রেণীকে প্রচণ্ড আঘাত করে। যাজকদের কাছ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

৩(খ).৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলজিয়াম, সুইটজারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানি, ইতালি ও পোল্যান্ডে এই বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এমনকি ব্রিটেনেও বিপ্লবের উত্তাপ অনুভূত হয়েছিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ

১৮১৫-তে বেলজিয়ামকে হল্যান্ড-এর সঙ্গে জোর করে যুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় থেকে দক্ষিণ নেদারল্যান্ড অর্থাৎ বেলজিয়ামের রোমান ক্যাথলিক ফরাসি ও ফ্লেমিস অধিবাসীদের মনে ওলন্দাজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। দক্ষিণ ও উত্তর নেদারল্যান্ডের উদ্বর্তনের ইতিহাসও আলাদা। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা ও ধর্ম আলাদা। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কৃষি ও বাণিজ্য ওলন্দাজদের প্রধান জীবিকা। এরা অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বেলজিয়াম দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছিল এবং বেলজিয়ামের শিল্পপতিরা শুল্ক সংরক্ষণ চেয়েছিল। বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ভিয়েনা শক্তিবর্গ বেলজিয়ামের ক্যাথলিক যাজক, নির্মাতা সম্প্রদায়, ইতিহাস সচেতন বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। সংযুক্ত রাষ্ট্রে বেলজিয়ানদের সংখ্যা ছিল ওলন্দাজদের দ্বিগুণ। কিন্তু স্টেট্স জেনারেলে ওলন্দাজ ও বেলজিয়ানদের প্রতিনিধি ছিল সমসংখ্যক। দেশের প্রশাসনে ওলন্দাজ কর্মচারীদের আধিপত্য ছিল এবং সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজদের স্বার্থরক্ষা। এই থেকেই বেলজিয়ানদের মুক্তপন্থী বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল রাজা প্রথম উইলিয়ামের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ।

১৮৩০ সালের উৎপাদন সংকট আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। এই সময়ে আসে ফরাসি বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ। ফলে দাবানলের মত বেড়ে উঠে বেলজিয়ানের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে ১৮৩৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ একটি চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়।

৩(খ).৬ মধ্য ইউরোপের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

সুইটজারল্যান্ড : জুলাই বিপ্লবের পর সুইটজারল্যান্ডের ২২টি ক্যান্টনকে বিপ্লবী আবেগ স্পর্শ করেছিল। এইসব ক্যান্টনের সরকারসমূহের অধিকাংশই ১৮২৫ পর্যন্ত রক্ষণশীল অভিজাতদের হাতে ছিল। ১৮২৫-এর পর কয়েকটি ক্যান্টনে মুক্তপন্থী গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে অবশিষ্ট ক্যান্টনসমূহে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়।

জার্মানি : জার্মান কনফেডারেশনেও এই সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রনসত্বিকের ডিউক বিতাড়িত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী একটি মুক্তিপন্থী সংবিধান প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও হেসে-কাসেলে ও শাসকদের কাছ থেকে অনুরূপ সুবিধা আদায় করা হয়। ব্যাভারিয়া, ব্যাডেন ও হবুরটেমবুর্গে মুক্তপন্থী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ইতালি : ইতালিতে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৮৩০-এ বিদ্রোহের ফলে মডেনার চতুর্থ ফ্রান্সিস বিতাড়িত হন। এই বিদ্রোহের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্মার মারি লুইসকেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ্যাপেনাইন পর্বতমালার পূর্বদিকে পোপের রাজ্যে বিদ্রোহের ফলে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পোল্যান্ড : ১৮৩০-এর নভেম্বরের শেষভাগে পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান শুরু হয়। বিদ্রোহীরা একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং জারের কাছে সংস্কার দাবি করে।

স্পেন ও পর্তুগাল : স্পেন ও পর্তুগালে সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ সময়ে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ এসেছিল এই দুই দেশের সিংহাসনের দুই দাবিদারের কাছ থেকে। শেষপর্যন্ত এই দুই দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজার পক্ষে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের ফলে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রক্ষা পায়।

গ্রেট ব্রিটেন : এইসব ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ছিল ১৮৩২-এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার আইন। এই আইনের দ্বারা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয় এবং বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের শক্তির পুনর্বণ্টন করা হয়। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

৩(খ).৭ ১৮৪৮ সালে ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

১৮৪৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার বিপ্লব ঘটে। প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার, বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তুষ্টি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্লেশ ও সর্বোপরি ১৮৪৭—৪৮-এর উৎপাদন সংকট এই বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। জার্মানিতে ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী লড়াই নতুন করে শুরু হয়। ইতালিতে কারবোনারি গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য 'ইয়ং ইতালি', ও 'ইয়ং ইউরোপ' আন্দোলনের উদগাতা মাৎসিন্নি ইতালির জাতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। পোল্যান্ড ও সুইটজারল্যান্ডেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এইসব আন্দোলন যুগ পরিবর্তনের সূচনা করে। এমনকি অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যও এই ধাক্কা থেকে রেহাই পায়নি। রাজনৈতিক বিপ্লব থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক অভ্যুত্থান। ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন ও তার পরবর্তী পর্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত সময়টি আসলে ছিল রক্ষণশীলতার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার যুগ আর ১৮৩০—১৮৪৮ সাল ছিলো সর্ব অর্থেই বিপ্লবের ও পরিবর্তনের যুগ। ব্যপকতর অর্থে তাই ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পুরো সময়টিকেই বিপ্লবের বা পরিবর্তনের যুগ বলা যেতে পারে।

১৮৪৮-এ দ্রুত বিপ্লব সংগঠনের পেছনে শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এ যুগে আলসাস্ নর্মান্ডি লিয়ঁ, লোয়ার উপত্যকা ও লোরেনে শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্সে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিলো। এই শ্রেণী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে উন্নততর পরিবেশের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল। অথচ সরকার শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৮৪১-এ সরকার একটিমাত্র কারখানা আইন প্রণয়ন করে কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। সেঁ সিমঁ', ফুরিয়ের প্রমুখের প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এ-যুগের ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই দেখা দেয় ১৮৪৬-এর অর্থনৈতিক সংকট।

গোটা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপব্যাপী গম ও আলুর অজন্মা ও শিল্পে মন্দা থেকে এই সংকটের উদ্ভব ঘটে। অতিরিক্ত ফাটকাবাজি এই আর্থিক সংকট বাড়িয়ে দেয়, সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে উচ্চমহলের দুর্নীতি ও বিদেশনীতির ব্যর্থতার জন্য। ১৮৪০-এ তিয়ের (Thiers) মন্ত্রীসভার যুগে যে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত গড়ে উঠেছিল, পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার সংকটে তা বিনষ্ট হয়। আশ্রিত আরব জাতীয়তাবাদী

নেতা মহম্মদ আলিকে সমর্থন করে ফরাসী সরকার ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ে ভাঙন নিয়ে আসে। পূর্বাঞ্চলীয় সংকটের ফলে যখন যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়, তখন ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। মন্ত্রী গীজো জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে শেষরক্ষা করেন। কিন্তু ফরাসি যুবরাজ দ্যুক দ্য মঁ পঁসিয়ের ও স্পেনের রাজকুমারী ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মারি লুইসা ফারনান্ডোর বিয়েকে কেন্দ্র করে আবার সংকট দেখা দেয় ১৮৪৬-এ। এই বিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা লর্ড পামারস্টোনকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তার ফলে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতে ফাটল ধরে। ইউরোপের রক্ষণশীল রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবার গীজো লুই ফিলিপকে পরামর্শ দেন। সমগ্র ইউরোপে যখন মুক্তপন্থী হাওয়া, তখন রক্ষণশীল স্বৈরাচার, রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্রোহ যখন ঘনীভূত তখন সংসদীয় সংস্কারের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনই ভোজসভা (Banquet) আন্দোলন নামে বিখ্যাত। আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আন্দোলন, ভোজসভাকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী একত্রিত হয়েছিল।

১৮৪৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার এই ভোজসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে গীর্জার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। জনতার বিক্ষোভের এই স্পষ্ট চিহ্ন দেখে লুই ফিলিপ গীজোকে বরখাস্ত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্মুখে সৈন্যরা গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ঘটনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত রাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি নাবালক পৌত্র লুই ফিলিপ অ্যালবার্টের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে যান। বিপ্লবীরা এরপর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ফ্রান্সে স্থাপিত হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র।

৩(খ).৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮-এর বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। এইসব বিপ্লবের পরিণামও বিচিত্র। তবু এই বিপ্লবসমূহ একসূত্রে গাঁথা ছিল বলা চলে। কারণ এইসব বিপ্লবের উৎপত্তি ও লক্ষ্য, ঘটনা পরম্পরা ও পরিণামের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য এসেছে ইউরোপীয় সভ্যতার ঐক্য ও অনৈক্যের টানাপোড়েন থেকে। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অভিঘাতও এই সাদৃশ্যের আরকেটি কারণ।

সবচেয়ে প্রথমে যা লক্ষণীয় তা হল দেশ ও কালের সাদৃশ্য। ১৮১৫-র ভিয়েনা ব্যবস্থায় এক প্রজন্ম কেটে যাওয়ার পর ইউরোপে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি বিপ্লবই ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রত্যেক বিপ্লবই এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ১৮৪৮-এর সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এই হল সাধারণ চরিত্র। ১৮৪৮-এর বিপ্লব সচেতনভাবে ফ্রান্সের ১৭৮৯-এর মহান বিপ্লবকে অনুকরণ করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সক্রিয় করে ইউরোপে ফরাসী নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল এই বিপ্লবের। অস্ট্রিয়া ও ইতালিতে বিপ্লব সরাসরি ভিয়েনা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে হ্যাবসবুর্গ আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটাতে

চেয়েছিল। নতুন সংবিধান ও নির্বাচিত সংসদ প্রবর্তন করে ইতালি ও জার্মানীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ইতালীয় ও জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। হাঙ্গারীতে বিপ্লব ম্যাগিয়ার (Magyar) ও শ্লাভদের পরস্পর বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়ার বাইরে সব বিপ্লবেরই একটি নেতিবাচক ঐক্য ছিল : প্রত্যেক বিপ্লবই অস্ট্রিয়াবিরোধী, স্বৈরাচারবিরোধী ও রক্ষণশীলতা বিরোধী। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে মুক্তপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গভীর মতবিরোধ ছিল। বিপ্লবের অসাফল্যের অন্যতম কারণও তাই।

দ্বিতীয়ত, দেশে ও কালে এই বিপ্লবসমূহের পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিপ্লবের উৎসকেন্দ্র ছিল দুটি—ইতালি ও ফ্রান্স। ফ্রান্সের চেয়েও শক্তিশালী ঝটিকাকেন্দ্র ছিল ইতালি। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে বিপ্লব শুরু হয়েছিল ইতালির পালের্মোতে। কিন্তু ফ্রান্স তখনো বিপ্লবী প্রেরণার উৎস হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। তাই ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মার্চে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সর্বত্র বিপ্লব শুরু হয়ে যাওয়ার পরে প্যারিস আর বিপ্লবের কেন্দ্র থাকেনি। বরং বিপ্লবের কেন্দ্র সরে যায় ভিয়েনা ও বুদাপেস্তে, তুরীন ও রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে। বিপ্লবের নেতৃত্ব ফ্রান্স থেকে সরে যাওয়ায় এই বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী চরিত্র ধরা পড়ে। ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই ফ্রান্সও ব্রিটেনের মতো তৃপ্ত, রক্ষণশীল। কিন্তু ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনা জার্মানি অথবা পোল্যান্ড অথবা রুমানিয়ার ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনার সঙ্গে একসুরে বাঁধা ছিল।

তৃতীয়ত, যখন ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল, তখন কোনো কোনো দেশে কেন সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে অথবা কিছুই হয়নি তা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। যেমন পশ্চিমে ব্রিটেন ও বেলজিয়ামে এবং পূর্বে রাশিয়া এবং পোল্যান্ডে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লব প্রধানত মধ্য ইউরোপে ঘটেছে। যেসব দেশে শিল্পায়নের পরিমাণ কম, (যেমন—জার্মানি, ইতালি ও সুইটজারল্যান্ড) আর যেসব দেশ কৃষিপ্রধান ও কৃষক অধ্যুষিত (যেমন বল্‌কান অঞ্চলের দেশসমূহ) সেইসব দেশেই বিপ্লব হয়েছে।

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যবর্তী যুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রসার এবং ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মূলত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে ও যুগের বিপ্লবী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি উপাদান হল : ১৮১৫-র আগেকার ভাবধারা ও আদর্শের আলোড়ন; অভাবনীয় জনস্ফীতির জন্য অস্থিরতা এবং শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশপ্রসূত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিবর্তন দেশে দেশে এই তিনটি উপাদানের গুরুত্বের তারতম্য ঘটেছে। কিন্তু সর্বত্রই এই তিনটি উপাদানের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

১৮৪৮-এর বিপ্লবসমূহকে শহুরে বিপ্লব বলা যেতে পারে। সব বিপ্লবেরই উৎস শহর, প্রেরণাও শহর। ইউরোপের সব দেশে শহরের মানুষেরাই প্রথমদিকে বিপ্লবের ঘটনা পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। লন্ডন ও বার্মিংহাম, প্যারিস ও ব্রাসেলস, ভিয়েনা ও বুদাপেস্ত বিপ্লবের গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ব ইউরোপে যেসব শহরে এক লক্ষের বেশি অধিবাসী ছিলো, সেইসব শহরেই বিপ্লব এসেছে।

সব বিপ্লবেরই নেতৃত্ব এসেছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র, সাংবাদিক ও কবি—এরাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লামার্তিন ও পেটোফির মতো কবি, মাজ্জিনি ও কোসুথের মতো

সাংবাদিক, প্যালাকি, ডালমান ও বালসেসকোর মতো ঐতিহাসিক এইসব বিপ্লবের এক একটি রোম্যান্টিক চরিত্র বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বাধীন এইসব শহুরে বিপ্লবের ভাগ্য কিন্তু নির্ভর করছিল কৃষকদের উপর। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার কৃষক জমির বিপ্লবের পর মালিকানা পেয়ে যায়।

প্রাগ্রসর শিল্পায়িত দেশে, বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এবং অনেকাংশে জার্মানিতে ও ইতালিতে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৮-এ এই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব উপহার দিয়েছিল প্রাগের রক্তাক্ত 'জুনের দিন' এবং ভিয়েনার 'অক্টোবরের দিন'। এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের একটি বিশেষ পরিণাম স্মরণীয়। এই বিপ্লবের ফলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমাজতন্ত্র নিয়ে আসতে পারে, বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ভয় আর ছিল না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই বিপ্লবের পর।

১৮৪৮-এর নানা বিপ্লবকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল একটি রাজনৈতিক বাস্তব। এ যুগের রাজনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হাতিয়ার জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ কোনো কোনো দেশে বিভিন্ন অংশের ঐক্যের আন্দোলনের রূপ নিয়েছিলো। যেমন জার্মানি ও ইতালিতে। কোনো কোনো দেশে বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলনের রূপ নেয় জাতীয়তাবাদ। যেমন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যাইহোক, ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠিত হবার পরই এই বিভিন্ন ধরনে তা ইউরোপের অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংকটই যে বিপ্লব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজতন্ত্রী ও বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী—কৃষকশ্রেণী—এই ধরনের শ্রেণীবিরোধ বিপ্লবের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সাধারণভাবে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সাধারণভাবে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবসমূহের দ্রুত বিস্তারের প্রদান কারণ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণী বিরোধ।

তবে পরিবর্তনের আদর্শ ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলেও ১৮৪৮-এর পর কিন্তু সাময়িকভাবে রক্ষণশীলতারই জয় হয়। ১৮৫০ সাল নাগাদ জার্মান ও ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে, স্লাভ হাংগারি ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনও ভেঙে যায়। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াতেও সাবেকপন্থীদের প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি ফ্রান্সে ১৮৫১ সালে তৃতীয় নেপোলিয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ এই সময়পর্বকে উচ্চ আশা ও আদর্শের যুগ বলা গেলেও পুর্ণ সাফল্যের যুগ সম্ভবত বলা যায় না।

৩(খ).৯ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাস ফরাসি বিপ্লবেরই অনুবৃত্তি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সের মানুষ লোকায়ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। কখনও তারা দু'পা এগিয়েছে, কখনও এক পা পিছিয়েছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিল বুরবোঁ বংশ। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে এই রাজবংশ সিংহাসন হারায়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আশায় ফরাসিরা অর্লেয়াঁ বংশের লুই ফিলিপকে বসায়। কিন্তু এই রাজাও স্বৈরাচারের দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় ১৮৪৮-এর বিপ্লবে বিতাড়িত হন। ফ্রান্সে ঘোষিত হয় দ্বিতীয়

সাধারণতন্ত্র বা Second Republic। বিপ্লবের ঢেউ ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য ১৮৫০ নাগাদ এই ঢেউ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

৩(খ).১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

২। ফ্রান্সে ও তার বাইরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব কি ছিল?

৩। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্রুত সংঘটনের কারণ কি?

৪। ১৮৪৮-এর ইউরোপীয় বিপ্লবগুলোর সাধারণ প্রকৃতি ও চরিত্র ছিল কি?

৫। আপনি কি মনে করেন যে, ১৮১৫—১৮৪৮ যতটা 'প্রত্যাশার যুগ', ততটা 'প্রাপ্তির যুগ' নয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। উনিশ শতকের ইউরোপের স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত বলতে কি বোঝায়?

২। অষ্টাদশ লুই কি উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?

৩। দশম চার্লস কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন?

৪। ১৮৩০-এর ফরাসি অর্ডিন্যান্সগুলি কি কি?

৫। ১৮৩০-এর বিপ্লবের কি প্রভাব ইংল্যান্ডের উপর পড়ে?

৬। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে শ্রমিকদের ভূমিকা কি ছিল?

৭। 'ভোজসভা আন্দোলন' কি?

৮। ১৮৪৬-এর বিবাহ সংকট ব্যাখ্যা করুন।

৯। ১৮৪৮-এর বিপ্লব কোন রাজবংশংকে ফরাসী সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়?

১০। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। J. Grenrille : Europe Reshaped.

২। Jonathan Sperber : The European Revolutions.

৩। G. Ruggiero : The History of European Liberalism.

৪। B. L. Woodward : French Revolutions.

৫। P. Robertson : Revolutions of 1848.

৬। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস।

একক ৪ ❑ দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ও তৃতীয় নেপোলিয়ান প্যারিকমিউন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

৪.৪ লুই নেপোলিয়ন

৪.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

৪.৬ তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ নীতি

৪.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

৪.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

৪.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

৪.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ

৪.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৪.১২ প্যারি কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

৪.১৩ প্যারি কমিউনের পতনের কারণ

৪.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

৪.১৫ সার-সংক্ষেপ

৪.১৬ অনুশীলনী

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের স্থাপন করা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করে কিভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৮৭০ সালে সেই সাম্রাজ্যের পতনের পর কেন প্যারিসে একটি স্বতন্ত্র কমিউনের উত্থান ও পতন ঘটেছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করাই বর্তমান এককটির উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের গণবিপ্লবের সাফল্য ছিল সাময়িক। এই বিপ্লবের পর যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম নেপোলিয় বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ঁ বা তৃতীয় নেপোলিয়ন। বুর্জোয়াদের দুর্বলতা, প্রজাতন্ত্রীদের মতবিরোধ এবং নেপোলিয়নের ঐতিহ্যের প্রতি ফরাসিদের মোহকে কাজে লাগিয়ে লুই নেপোলিয়ন ১৮৫২ সালে প্রজাতন্ত্রকে নাকচ করে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফ্রান্সের রাজধানীতে শ্রমজীবীদের সরকার 'প্যারি কমিউন' নাম নিয়ে গড়ে ওঠে। ছ'সপ্তাহ পরে অবশ্য প্রজাতন্ত্রীদের হাতে কমিউনেরও পতন ঘটে। বর্তমান এককে এই ঘটনাপরম্পরাই নির্দেশিত হবে।

৪.৩ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের যৌথ উদ্যোগে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাদের মধ্যে বিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী নির্বাচনে লুই ব্লাঁ-র সমাজতন্ত্রী দল পরাজিত হওয়ায় বামপন্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে পোল্যান্ডের বিপ্লবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রী সরকার কোন সাহায্য না করায় সমাজতন্ত্রীরা পনেরোই মে তারিখে বিধানসভা ভবন অধিকার করার চেষ্টা করে। বিদেশমন্ত্রী লা মাতিন-এর চেষ্টায় অবশ্য বিধানসভা রক্ষা পায়। এরপর জুন মাসে সরকার সব জাতীয় কর্মশালা বন্ধ করে দেয়, বেকার হয়ে যায় লক্ষাধিক শ্রমিক। ২৩-জুন তারা প্রতিবাদ অবরোধে সামিল হয়। এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধমন্ত্রী য়্যজেন কাভেনিয়াক (Eugene Cavaignac)। ২৩ থেকে ২৬ জুন—এই চারদিনে প্রায় দশহাজার মানুষ হতাহত হয়। কয়েক হাজার শ্রমিক কারারুদ্ধ হয়। ইউরোপের ইতিহাসে তাই দিনগুলো 'জুন ডেজ' নামে কলঙ্কিত হয়ে আসে। ঐতিহাসিকরা বলেন, সন্ত্রাসের রাজত্বেও ফ্রান্সে এত রক্তক্ষয় হয়নি।

শ্রমিকদের ও সমাজতন্ত্রীদের দমন করবার পর ফ্রান্সের National Assembly বা জাতীয় সভা, মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর ভাষায় Assembly of Capitalists, একটি সংবিধান প্রস্তুত করে। সংবিধানে প্রশাসনের প্রধান হিসেবে চার বছরের জন্য জন-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রক্ষকরা ভেবেছিলেন, ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট সরকারকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল তাদের সবাইকেই হতচকিত করে দেয়। নির্বাচনে লা মাতিন বা কাভেনিয়াককে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ান বা তৃতীয় নেপোলিয়ন।

৪.৪ লুই নেপোলিয়ন

লুই নেপোলিয়ন ছিলেন বোনাপার্ট-পত্নী জেসোফিন-এর কন্যা হরটেন্‌শ্‌ ব্যুহানে এবং বোনাপার্ট-ভ্রাতা লুই-এর সন্তান। প্রথম নেপোলিয়ন-এর পুত্র 'ডিউক অব্‌ রাইখস্টাড্‌ট্‌' যেহেতু দ্বিতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, তাই লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে পরিচিত করে বোনাপার্টীয় ধারার

প্রবহমানতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৮৩০-এর বিপ্লবের পর তিনি ফ্রান্সে ফিরে এসে দু'বার (১৮৩৬, ১৮৪০) ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্রের শাস্তিস্বরূপ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ১৮৪৬-এ হ্যাম দুর্গের কারাগার থেকে তিনি পালিয়ে যান এবং ৪৮-এর বিপ্লবের পর আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ধনী অভিজাত বন্ধুদের সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক পরিচিত লাভ করেন এবং ফরাসিদের মনে বেঁচে থাকা বোনাপার্টের গৌরবের স্মৃতিকে কৌশলে কাজে লাগাতে থাকেন। কুখ্যাত 'জুন ডেজ'-এর পর প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি ফরাসিদের তীব্র বিরক্তির সুযোগে তিনিই সবাইকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৪.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

লুই নেপোলিয়ন এমন একটা সময়ে জনসমর্থন চেয়েছিলেন যখন ফ্রান্সের মানুষ সমর্থন করবার জন্যই একজন অপ্রজাতন্ত্রী কিন্তু জনদরদী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ছিল। জুন দিনের অভিজ্ঞতা তাদের ক্লান্ত-বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। এর থেকে মুক্তির জন্য তারা লুই-এর হাত ধরতে চেয়েছিল। কেননা ইতিমধ্যেই লুই তাঁর 'The Napoleonic ideas' এবং 'The Extinction of Pauperism' বই দুটোতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর বিপ্লব-বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দরিদ্রের জন্য, ফরাসিদের সকলের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ও সমাধান-স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরা, স্বল্পবিত্তরা তাঁকে দেখেছিলেন এক ভিন্ন ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। উচ্চবিত্তরা ভেবেছিলেন, বোনাপার্টের মতো ফরাসি-পুঁজির লক্ষণীয় স্ফীতির ব্যবস্থা তিনি করবেন। লুই নেপোলিয়ন রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তুষ্ট করতে ভোলেননি। পাদ্রীদের তিনি বুঝিয়েছিলেন, রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা হাতে পেলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাশাপাশি চার্চ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাও চালু করা হবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের সবশ্রেণীর মানুষই তাঁর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নিজেই তাঁর শেষ জীবনে যে 'মিথ' তৈরি করে গিয়েছিলেন, যে মিথকে অর্লেয়া রাজতন্ত্র ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল বুঁধ রাজতন্ত্রকে নিষ্প্রভ করে দেখানোর উদ্দেশ্যে, সেই মিথকেই লুই নেপোলিয়ন নিজের স্বার্থে সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। তাই তার বিপুল জনসমর্থন। নির্বাচনে তিনি চার মিলিয়ন ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিলেন প্রজাতন্ত্রী কাভিয়েনাককে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কাজ চালিয়েছিলেন মাত্র চার বছর। যেহেতু প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক এবং প্রকৃত জনভিত্তি না থাকায় প্রজাতন্ত্রী নেতৃত্ব ছিল দুর্বল, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই একনায়কত্ব অর্জন করেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়। অবশেষে তিনি ১৮৫২ সালে এক গণভোটের রায় নিয়ে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য।

৪.৬ তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ নীতি

প্রথম নেপোলিয়নের মতোই তৃতীয় নেপোলিয়নও একটি কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রেখেছিলেন নিজের হাতে। অবশ্য একটি সেনেট ও দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ছিল। আইনসভার ওপরের কক্ষকে বলা হত 'কাউন্সিল অব্ স্টেট', নিম্নকক্ষকে বলা হত আইন পরিষদ, তার সদস্যসংখ্যা ২৬০।

আইনসভার ক্ষমতা ছিল সামান্য। সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিল সেনেট। মন্ত্রীপরিষদ কিন্তু আইনসভা বা সেনেটের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না। তাঁরা সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাদের অধীনে 'প্রিফেক্ট' পদবাচ্য আমলারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, কমিউক ও পৌরসভায় সম্রাটের নির্দেশ বলবৎ করত। তৃতীয় নেপোলিয়ন সেনাদের পদোন্নতির প্রচুর সুযোগ দিয়ে, তাদের বেশি মর্যাদা ও বেতন দিয়ে অনুগত করে রেখেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন নানাভাবে তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর আমলে যাজকদের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই বেড়েছিল। আর বেড়েছিল রাজধানীর জমক। তৃতীয় নেপোলিয়ন জর্জ হসম্যানকে প্যারিসের 'Prefect of the Seine' নিযুক্ত করেন। হসম্যান সম্রাটের মনের মতো করে আধুনিক সাজে সাজিয়ে ছিলেন প্যারিস শহরকে। ডেভিড টমসন একে বলেছেন, International Showmanship.

তবে তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি উদ্দেশ্যহীন ছিল না। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব ফরাসি নাগরিক জীবনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল, তার অবসান ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফ্রান্স তখনো প্রধানত কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাই কৃষকদের দিকে নজর দিয়েছিলেন। সরকারের তরফে ঢালাও কৃষিঋণ আর অল্প সুদের বিধান দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র জমির মালিকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শিল্প থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেননি তৃতীয় নেপোলিয়ন। শিল্পের প্রয়োজনে পরিবহণের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে ফ্রান্সের রেলপথের বিস্তার জার্মানী ও ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা শিল্প ও ধাতুশিল্পের বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছিল।

আলফ্রেড কোবান মনে করেন, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে ঋণব্যবস্থার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে তাই ব্যাঙ্কিং-এর স্বর্ণযুগও বলা চলে। সরকারি ও বেসরকারি—দুই প্রকার সংস্থা থেকেই ঋণ দেওয়া হত। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি হল—কঁতোয়া দ্য কোঁতে (Comptoir d'es Compute), ক্রেডিট ফঁসিয়ের (Credit Foncier) এবং ক্রেডিট এগ্রিকোল (Credit Agricole)। বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেরিয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রেডিট মবিলিয়ের (Credit Mobilier)। ১৮৬৩-তে আর একটি বড় বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্রেডিট লিয়ন্যে (Credit Lyonnais)। এই বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল বিখ্যাত 'রথস্চাইল্ড' সংস্থা। বলা যেতে পারে ফ্রান্সের মুদ্রাব্যবস্থা সচলতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট এইসব ব্যাঙ্কের কল্যাণে। তাতে লাভবান হয়েছিল কৃষি ও শিল্প।

রাষ্ট্রে উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিক সেঁ সিমঁ'-র এই বক্তব্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিল কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবে গ্রেনভিল যে শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়র অবদানকে মোটেই বড় করে দেখতে চান না, সেটা ঠিক নয়। শুধু মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি করে নয়, অন্যান্য নানা উপায়েও সম্রাট শিল্পের বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। ১৮৬৪-তে শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার মেনে নিয়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দলকে তিনি রাষ্ট্রের খরচে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছিলেন। শ্রম-বিবাদ মেটানোর জন্য তিনি সালিসী-বোর্ড স্থাপন করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ধর্মঘট আটকানোই সম্ভবত তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে শিল্পায়নের যে অনেক বাধাই দূর করা গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।